নারীর স্বাস্থ্য : নিজের যত্ন নিন

উম্মে মুসলিমা

> জেলখানায় ফাঁসির পূর্বে দয়ালু সিভিল সার্জন চন্দরাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কাহাকেও দেখিতে ইচ্ছা কর?"
>
> চন্দরা কহিল, "একবার আমার মাকে দেখিতে চাই।"
>
> ডাক্তার কহিল, "তোমার স্বামী তোমাকে দেখিতে চায়, তাহাকে কি ডাকিয়া আনিব?"
>
> চন্দরা কহিল, "মরণ!—"

রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' গল্পের নায়িকা চন্দরা স্বামীর প্রতি সীমাহীন অভিমানে নিজের ঘাড়ে মিথ্যে দোষ নিয়ে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলেছে। স্বামীর প্রতি অভিমান বাঙালি নারীর সহজাত। স্বামী অবহেলা করলে নারী নিজের প্রতি অত্যাচার করে, আত্মঘাতী হয়, আড়ালে কেঁদে বুক ভাসায় কিন্তু প্রতিকারের পদক্ষেপ নেয় না। কেন? না, স্বামী কেন নিজে এসে উদ্বিগ্ন হয়ে সবকিছুর খোঁজখবর করে না? প্রতিকারের ব্যবস্থা নেয় না? সংসারের জন্য উদয়াস্ত খাটতে খাটতে যে নারীর হাড়মা'স কালি হয়, সে কেন মুখ ফুটে বলতে যাবে তার ব্যক্তিগত অসুবিধা, অসুখ বা কোনো চাহিদার কথা? অন্যের ভালো থাকার জন্য যে নারী নিজের সুখ-শান্তি বিসর্জন দেয়, সে কি নিজের প্রতি অন্যের এতটুকু মনোযোগ আশা করতে পারে না? তাকে অন্যের মনোযোগ ভিক্ষা করতে হবে কেন?

এখনো এদেশের গৃহাভ্যন্তরের ৯০ ভাগ কাজই নারীকে করতে হয়, হোক না সে নারী গৃহবধূ বা কর্মজীবী। এ এক অলিখিত সংবিধান নারীর ওপর অর্পিত হয়েছে জন্মাবধি। হয়ত শিক্ষা, সমতা, বাস্তবতাবোধ ও সহমর্মিতার সমন্বয় হলে একদিন এ সংকট ঘুচবে। কিন্তু যতদিন না ঘুচে ততদিন নারীর নিজেকে নিজের প্রতি যত্ন নিতে হবে। আমাদের পুরুষেরা বিদেশে গিয়ে একা একা ঘরকন্না করছেন, নিয়ম মেনে চলছেন। আর যেই না দেশে ফিরলেন অমনি ফুলবাবু। হুকুমের বাদশা। ভাবখানা এমন যে, নারীদের কাজ যদি আমরাই করে দেই ওরা তাহলে কী করবে? বসে বসে আরাম করবে? বেশ কিছুদিন আগে যখন ওয়াশিং মেশিন কেনার ধুম পড়ল, তখন এক ভদ্রলোক ওটা কেনার বিপক্ষে যুক্তি দেখালেন, 'এতে গৃহপরিচারিকার কাজ কমে যাবে না? ওই সময়টাতে তারা হয় টিভি দেখবে না হয় ঘুমাবে, ওসবের দরকার নেই।' মানে নেই কাজ তো খৈ ভাজ। নারীর জন্য সমাজ নির্ধারিত কাজ; যেমন, বাচ্চা লালনপালন, রান্নাবাড়া, পানির ব্যবস্থা, ঘর গুছানো, খাওয়ানো, সেবাযত্ন, ইত্যাদি পুরুষরা করতে চান না। কেউ দয়াপরবশ হয়ে করলে তার পৌরুষ নিয়ে অনেকে সন্দেহ পোষণ করেন। অথচ পুরুষের কাজ (বাহুবলের ভিত্তিতে) বলে প্রতীয়মান জমি চাষ, ফসল তোলা, মাড়ানো, বাড়িঘর-রাস্তাঘাট নির্মাণের শ্রমসাধ্য কাজ কিন্তু নারীরা ঠিকই করছেন বা করতে বাধ্য হচ্ছেন। নারীদের কিন্তু সেখানে 'মর্দা' বলে টিপ্পনি কাটা হয় না। কারণ যেখানে পুরুষের সুবিধা নিহিত, সেখানেই তাদের প্রথার গোড়াপত্তন। এত সামাজিক পরিবর্তনের পরও এখনো সংসারের হাল নারীকেই ধরে রাখতে হয়। 'করব না কাজ, দেখে নাও' বলে নারী তো পারেন না উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতে। কিন্তু নারীরও তো শরীর। নারীশরীরের অভ্যন্তরভাগ পুরুষের তুলনায় জটিল। নারীর প্রজননস্বাস্থ্য সঠিক পরিচর্যা না পেলে এর প্রতিটি শাখা-প্রশাখা রোগাক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে উন্মুখ থাকে।

রেহানা বানু (ছদ্মনাম) একজন গৃহ ব্যবস্থাপক। যৌবনে খুব সুন্দরী ছিলেন। সংসারের জন্য প্রাণপাত করেছেন। চিকিৎসক স্বামী ও চার ছেলেমেয়ে নিয়ে এক সুখী পরিবারের হাল ধরে ছিলেন। স্তনে ছোট্ট দলা অনুভব করেছেন ৩০ বছর বয়সের দিকে। গুরুত্বই দেন নি। স্বামীকেও বলেন নি। বিয়ের সময় তার মা তাকে শিখিয়ে

দিয়েছিলেন, 'মেয়েদের হতে হয় সর্বংসহা। সামান্য কারণে ভেঙে পড়লে চলবে না। সংসারের হাল শক্ত হাতে ধরে রাখতে হবে। স্বামীর কানের কাছে সারাক্ষণ ঘ্যান ঘ্যান করা যাবে না। সামান্য জ্বর-জ্বালায় বাড়ির সবাইকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলা ঠিক নয়'। রেহানা বানু যখন নিজের অসহ্য যন্ত্রণার কথা আর গোপন রাখতে পারছিলেন না, তখন তার মেয়ের বয়স ১৮ বছর। লজ্জায়, ভয়ে, সংকোচে তিনি এরকম অসুখের কথা কাউকে না বলে যখন যন্ত্রণার চরমে পৌঁছে গেছেন, তখন মেয়ে আবিষ্কার করে তার মায়ের স্তনক্যানসার প্রায় চিকিৎসার বাইরে চলে গেছে। সবাই মিলে বোম্বে ক্যানসার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। আরো আগে চিকিৎসা হলে ২০-২৫ বছর বেঁচে থাকা কোনো ব্যাপারই ছিল না, ডাক্তার বললেন। রেহানা বানুকে চারটে কেমো দেবার পর আর নিতে পারলেন না। অপারেশনের দুই বছরের মাথায় চারমাস ধরে অবর্ণনীয় যন্ত্রণা সয়ে মেয়ের কোলে মাথা দিয়ে জীবনের অবসান ঘটালেন। পড়ে রইল তার অসমাপ্ত আচারের সরঞ্জাম, অপ্রকাশিত কবিতার পাণ্ডুলিপি, ছেলের বিয়ে, মেয়ের রেজাল্ট, স্বামীর পদোন্নতির আসন্ন সুসংবাদ।

চাকুরিজীবী, শ্রমিক, উদ্যোক্তা বা গৃহ ব্যবস্থাপক নারীর মধ্যে অধিকাংশই নিজেদের কেনাকাটা নিজেরা সারেন। অনেকে প্রতি সপ্তাহে একবার করে বাজারে বেরোন, কাঁচাবাজার করা তো অনেক নারীর একক দায়িত্ব। অনেকে ভালো দাম-দর করতে পারেন বলে প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজনের আবদার ফেলতে না পেরে আরো ঘন ঘন বেরোন। অনেকে বিউটি পারলারে গিয়ে সময় নিয়ে সৌন্দর্যসেবা নিয়ে থাকেন। কিন্তু ডাক্তার দেখানোর কথা উঠলেই বলেন, 'ওনাকে বলেছি, কাজের খুব চাপ তো, একটু সময় বের করতে পারলেই নিয়ে যাবেন'। অথবা কেউ বলেন, 'ডাক্তারের কাছে একা যেতে ভয় লাগে। কী অসুখ বের হয় কে জানে?' সবচে' বেশি যে বিষয়টা নারীরা করে থাকেন, তা হলো অসুখকে উপেক্ষা করা। শরীরে কোনো একটা অসংগতি দেখা দিলে সেটাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে দীর্ঘদিন পুষে রাখেন। যখন অবস্থা চিকিৎসার বাইরে চলে যেতে শুরু করে কেবল তখনই তাদের টনক নড়ে। কিংবা অসুস্থতার ভারে যখন তিনি সংসারের কাজে মন দিতে পারেন না তখন বাধ্য হয়ে তাকে ডাক্তারের কাছে নিতে হয়। যখন নেয়া হয়, তখন দেখা যায় শরীরের নদীজল অনেকদূর গড়িয়ে গেছে। কিছুদিন যমে-মানুষে টানাটানি। তারপর ভবলীলা সাঙ্গ।

সরকারি জরিপ ও প্রভাবশালী চিকিৎসা সাময়িকী ল্যানসেট-এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী, প্রতিদিন বাংলাদেশে গড়ে ২১ জন মায়ের মৃত্যু হচ্ছে। এসব মৃত্যুর প্রত্যক্ষ কারণের মধ্যে আছে রক্তক্ষরণ, খিঁচুনি, বিলম্বিত প্রসব, গর্ভপাত, ইত্যাদি। পরোক্ষ কারণের মধ্যে ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, ক্যানসার, যক্ষ্মা, রক্তস্বল্পতা, হেপাইটাইটিস। পরোক্ষ কারণের বিষয়ে নজর দেয়া বেশি জরুরি বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। পরোক্ষ কারণের জটিলতাগুলো প্রসবপূর্ববর্তী অসুস্থতা। নারী এ সময়েও তার রোগের কথা প্রকাশ করতে চান না। হয়ত দেখা গেল, প্রসবপূর্ববর্তী অসুস্থতার কারণে শিশুটিকে বাঁচানো সম্ভব হলো কিন্তু মা চলে গেলেন পরপারে।

মনোবেদনা বিনিময়যোগ্য। সহানুভূতি-ভালোবাসা-স্পর্শ-পরামর্শ-ভ্রমণ ইত্যাদিতে মনের যাতনা কমে বা চলে যায়। মনোবেদনা উপশমের ব্যাপারে বলা হয়, 'টাইম ইজ দা বেস্ট হিলার'। কিন্তু গায়ের ঘায়ের ব্যথা সহানুভূতির মলমে দূর করা যায় না। ওর জন্যে লাগে সঠিক ওষুধ ও পরিচর্যা। সবসময় মনে রাখতে হবে, সময়ের এক ফোঁড়, অসময়ের দশ। অসময়ের ফোঁড় আবার ধোপে টেকেও না।

মনে রাখতে হবে, জীবনটা যার যার নিজের। কেবল পরের মন জুগিয়ে চলতে গিয়ে নিজের দিকে তাকাতে না পারলে ক্ষতি আর কারো নয়, নারীর নিজেরই। কেউ দয়া করে তাকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাবেন, তা না হলে তিনি নিজে থেকে যাবেন না, এসব ফালতু অভিমান বর্জন করাই বাঞ্ছনীয়। গ্রামে-গঞ্জে-শহরে-বন্দরে চিকিৎসাসেবা প্রতুল না হলেও দুর্লভ নয়। প্রয়োজন স্বেচ্ছাশক্তি। চিকিৎসাবিজ্ঞান বলে, কোনো রোগ প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়ার পর সঠিক চিকিৎসা করালে সেরে ওঠার সম্ভাবনা প্রায় শতভাগ। অথচ আমাদের নারীরা অবহেলা আর অভিমান করে একপ্রকার আত্মঘাতীই হচ্ছেন। আমাদের অনেক পরিবারে ক্যানসার বা এইডস-

আক্রান্তদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়। অনেক স্বামী এমন স্ত্রীদের সংসর্গ ত্যাগ করেন। কেউ কেউ পুনর্বিবাহের প্রস্তুতি নেন। আক্রান্ত নারীরাও অনেকে হীনম্মন্যতায় ভোগেন। অথচ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন অধ্যাপককে জানি, তিনি সময়মতো নিজের উদ্যোগে চিকিৎসা করে দাপটের সাথে জীবনযাপন করছেন। একজন স্বনামধন্য কবি ও রাজনীতিক প্রাথমিক অবস্থায় অপারেশনের পর সুস্থ জীবন নিয়ে দীর্ঘদিন সমাজের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছেন। অনেক সুস্থ নারীও এদের মতো কর্মক্ষম নন।

এ সুন্দর পৃথিবীতে কতদিন সুস্থ হয়ে বেঁচে থাকা যায়, সবার আগে সে চেষ্টাই করা উচিত। আর এ সুস্থতা শুধু শারীরিক স্বাস্থ্যই নয়, মানসিক স্বাস্থ্যের জন্যও জরুরি। মনীষীরা বলেন, 'সুস্থতা আর পুরোনো স্মৃতিই হচ্ছে সুখ'। উপমহাদেশের প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী তনুশ্রী শংকরকে ভালো থাকার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলছিলেন, 'ইতিবাচক মনোভাব ও শরীরের সুস্থতাই ভালো থাকার প্রধান অবলম্বন'। কারণ যে অসুস্থ তিনি কেবল নিজেই অসুস্থ নন, তার আশেপাশের মানুষদেরও অসুস্থ করে তোলেন। নিজে সুস্থ না থাকলে নিজের হাতে গড়া সুখী চারকোণ বিন্দুমাত্র আনন্দ দেবে না। সুস্থতাই সকল সুখের মূল। অসুখ তা যে প্রকারেরই হোক, গোড়াতেই একে নির্মূল করার পদক্ষেপ নিতে হবে। মনে রাখবেন, আপনি অসময়ে চলে গেলেও পৃথিবী তার নিজের নিয়মেই বয়ে যাবে।

উম্মে মুসলিমা কথাসাহিত্যিক ও লিঙ্গসমতাবাদী লেখক। muslima.umme@gmail.com